SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

অদ্বৈতবাদের আলোয় মানবতাবাদ ও আজকের সমাজ

Madhumita Guchhait
Former Student, Dept. of Sanskrit,
Vidyasagar University, Midnapore, West Bengal, India
Email: guchhaitmadhumita927@gmail.com

Abstract: অদ্বৈতবাদ ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক দার্শনিক ধারা, যার মূল শিক্ষা হল- ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই ঐক্যচেতনা মানুষকে ভেদাভেদের গণ্ডি অতিক্রম করে সর্বজনীন চেতনার অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয়। এই দর্শনে জগতের বহুত্ব কেবল মায়া বা অবিদ্যার ফল, অথচ পরমতত্ত্ব এক ও অভেদ। আধুনিক সমাজে বৈষম্য, প্রতিযোগিতা, ভোগবাদ ও অসহিষ্ণুতার যে প্রবল স্রোত দেখা যায়, তা মানবিক মূল্যবোধকে ক্রমশ ক্ষয় করছে। এই সংকটে অদ্বৈতবাদের ঐক্যবোধ মানবতাবাদকে আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে এবং মানুষকে সমানভাবে দেখার শিক্ষা দেয়। অদ্বৈতচিন্তা মানুষকে নিজের স্বার্থসীমা ছাড়িয়ে অপরের কল্যাণে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে সমাজে সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা ও শান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। সমকালীন বিশ্বে, যেখানে বিভাজন দিন দিন বাড়ছে, সেখানে অদ্বৈতবাদের আলোয় মানবতাবাদ এক কার্যকর জীবনদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়।

Keywords: ব্রহ্মচেতনা, আত্ম-অভিন্নতা, সমন্বয়, সর্বজনীনতা, মানবকল্যাণ, আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ, সামাজিক সম্প্রীতি, নৈতিক মূল্যবোধ।

ভূমিকা— মানব সভ্যতার ইতিহাসে দর্শন এক গুরুত্বপূর্ণ দিশারী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। ভারতীয় দর্শন সমূহের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত একটি মৌলিক ও গভীর দর্শন, যা ব্যক্তি ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যের ধারণাকে সর্বাগ্রে স্থাপন করেছে। অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য হল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মায়া, আর আত্মা ব্রহ্মের অভিন্নরূপ। এই দার্শনিক বাণী মানবজাতির মধ্যে এক গভীর সমতার ধারণা জাগিয়ে তোলে। এই দর্শন ভারতীয় চিন্তাধারায় সর্বজনীন ঐক্যের এক গভীর ভিত্তি রচনা করেছে। অদ্বৈতবাদে মানবতাবাদ বলতে মানুষকে আলাদা বা ভিন্ন না মনে করা। বরং সকলকে একই আত্মার অংশ বা প্রকাশ হিসেবে দেখা, এবং সেই একাত্মবোধের ভিত্তিতে সহমর্মিতা, দয়া ও নৈতিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। বর্তমান সমাজে মানবতাবাদ উদ্ভূত হয়েছে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সহানুভূতি ও সমতার চেতনা বাড়ার কারণে। আধুনিক সময়ে শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতার প্রসার, এবং বিভিন্ন দার্শনিকের শিক্ষাগ্রহণ সমাজে মানবতাবাদের অবস্থানকে আরও মজবুত করে তুলেছে। তাই আজকের সমাজে মানবতাবাদ বলতে বোঝায়— অন্যের কল্যাণে মনোনিবেশ করা, এবং সকলকে সমানভাবে দেখা।

অদ্বৈতত্ত্বের উৎস ও বিবর্তন— "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"[1] ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। এখানে বলা হয়েছে— সত্য বা সত্তা একক, তবে জ্ঞানীরা তাকে নানা নামে আখ্যায়িত করেন। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে জগৎ বহুরূপী হলেও এর অন্তঃস্থ ভিত্তি অভিন্ন। মানুষের অভিজ্ঞতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও বোধের ভিন্নতার কারণে সেই একটিই সত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়। এই ধারনাই অদ্বৈতবাদের মূল উৎস। অদ্বৈতদর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল— সকল বহুত্বের আড়ালে একটি অভিন্ন সত্য বা ব্রহ্ম বিরাজমান। ঋগ্বেদের এই উক্তি বহুত্বকে অস্বীকার করে না, বরং বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে। আজকের বিশ্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষ বিভক্ত। একদিকে প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে,

অপরদিকে সামাজিক বিভাজন ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ঋগ্বেদের বাণী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে— সত্য এক,আমরা সকলে তার অংশীদার। এর মাধ্যমে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতার আদর্শ সুদৃঢ় হয়। মানবতাবাদ আসলে সেই চিন্তা যা মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষের মধ্যে বিভাজন নয়, বরং ঐক্য ও সহাবস্থানের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ার প্রয়াস। অদ্বৈতবাদ এই মানবতাবাদের জন্য দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। কারণ অদ্বৈত চিন্তা বহুত্বের আড়ালে ঐক্যের বোধ জাগায়। ফলে সমাজে বৈষম্য, জাতপাত, বর্ণভেদ ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরির্বতে সমতা, সৌহার্দ্য ও মানবিকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়।

ব্রাহ্মণসাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম একটি গুরূত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেখানে প্রধানত যজ্ঞকেন্দ্রিক আচার ও বিধান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে কেবল আচারসংহিতা নয়, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে দার্শনিক ব্যঞ্জনা। যজ্ঞ,দেবতা এবং মানুষের সম্পর্ককে যে কাঠামোর মধ্যে ব্রাহ্মণসাহিত্য উপস্থাপন করেছে, তার ভেতরে মানবতাবাদের একটি সূক্ষ্ম সূত্র অঙ্কিত। অদ্বৈতবাদের আলোকে এই সূত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এখানে মানুষকে এক মহাজাগতিক ঐক্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে— "যজ্ঞো বৈ ব্রহ্ম"[2] যজ্ঞই ব্রহ্ম অর্থাৎ, যজ্ঞ হল সেই সর্বজনীন চেতনার প্রতীক, যা সবার মধ্যে বিদ্যমান। সমাজে জাতি,বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ বা অর্থনৈতিক পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেক মানুষ সমানভাবে সেই মহাজাগতিক ঐক্যের অংশ। আজকের গণতান্ত্রিক সমাজে মানবাধিকার, সমান সুযোগ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলছে, তার মূল দর্শন ব্রাহ্মণসাহিত্যের এই অদ্বৈত ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের ধর্ম হল সমষ্টিগত সমাজকল্যাণ, এবং সমাজের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সেই সম্মিলিত কর্তব্য পালনের উপর। অদ্বৈতবাদের মতে, সবই ব্রহ্ম-জগৎ, সমাজ, ব্যক্তি, প্রকৃতি। তাই সামাজিক কর্তব্য মানে কেবল সমাজরক্ষা নয়, বরং ব্রহ্মসাধনা। যদি সব মানুষ একই ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ হয়, তবে তাদের সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সবার কল্যাণ সাধন করা মানবতাবাদী কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। আজকের সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা ও ভোগবাদ মানুষের ভিতরে বিভাজন তৈরি করেছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে— "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"[3] অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। বিষ্ণু এখানে সর্বব্যাপী, সর্বধারক সত্য। যজ্ঞকে বিষ্ণু রূপে দেখানো মানে যজ্ঞই বিশ্বস্থিতির মূলনীতি। অদ্বৈতবাদের আলোয় এর অর্থ- যজ্ঞ মানে সেই এক ব্রহ্মচেতনার প্রকাশ, যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করছে। মানুষের কর্তব্য কেবল আচার পালনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজকে ধারণ করা, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের এই নৈতিক দর্শন একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক অদ্বৈত ভাবনার প্রতিফলন, অন্যদিকে মানবতাবাদের বুনিয়াদ। অদ্বৈত দর্শনে যেখানে জগৎ এক অখণ্ড সত্তার প্রকাশ, সেখানে মানবতাবাদ মানুষের মর্যাদা ও সমতার কথা বলে। এই দুইয়ের মিলনেই বোঝা যায়— অদ্বৈতবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি মানবতাবাদের নৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আজকের সমাজে জাতিগত সংঘাত, ধর্মীয় বিভাজন ও রাজনৈতিক স্বার্থে সহিংসতা ক্রমবর্ধমান। এমন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমস্ত মানুষের ভিতরে এক আত্মারই প্রকাশ, এবং সেই আত্মার বোধ থেকেই মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অদ্বৈতবাদের আলোয় মানবতাবাদ কেবল দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং সামাজিক জীবনের জন্য এক বাস্তব নৈতিক দিকনির্দেশ।

অদ্বৈত দর্শনের মূল শিক্ষা হল— ব্রহ্ম ও জগতের একত্ব, এবং জগতের সমস্ত সত্তার মধ্যে ঐক্যের বোধ। আরণ্যক সাহিত্যে যেমন ঐতরেয় আরণ্যক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক এ দেখা যায়, যজ্ঞকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে অন্তর্মুখী সাধনায়, যেখানে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে— "সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ"[4] অর্থাৎ সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলবে না। প্রিয় অথচ মিথ্যা বলবে না। এই হল চিরন্তন ধর্ম। এই মন্ত্র

মানুষের সামাজিক সহাবস্থান ও নৈতিক আচরণের মৌল ভিত্তি। মানবতাবাদের মূল দিক হল মানুষের মর্যাদা ও সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা, যা এই শ্লোকের মাধ্যমে প্রতিফলিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে "যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কদাচনেতি"[5] অর্থাৎ যেখান থেকে বাক ফিরে আসে, মনও পৌঁছাতে পারে না। সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যে জানে, সে আর কখনও ভয় পায় না। এখানে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদতত্ত্ব অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। মানবতাবাদের প্রেক্ষাপটে এই উপলব্ধি মানুষকে ভেদাভেদ ভুলিয়ে সর্বজনীন ঐক্যের পথে পরিচালিত করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[6] সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রতিটি সত্ত্বা একক পরমতত্ত্বের প্রকাশ। মানুষের মধ্যে পার্থক্য কেবল বাহ্যিক, ভেতরে সকলে একই ঐক্যতত্ত্বের অংশ। ফলে জাতি, ধর্ম,বর্ণ, লিঙ্গ বা শ্রেণীগত বিভাজন অর্থহীন। এই দর্শন সমাজে সমতা, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় করে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে "ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"[7] অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ী, কিছুই প্রিয় নয় তার নিজের জন্য আত্মার জন্যই সমস্ত কিছু প্রিয় হয়। মানুষের সমস্ত সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আকাঙ্খার মূলেই রয়েছে আত্মা, যা সর্বজনীন ব্রহ্মের প্রকাশ। ধন,স্বামী,স্ত্রী, পুত্র সমাজ সবকিছুই আত্মার জন্য প্রিয়। আত্মাকেই জানতে হবে,আত্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে কারণ— আত্মাকে জানলেই সবকিছু জানা হয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় বিভাজন, জাতিগত সংঘাত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। অদ্বৈত উপলব্ধি মানুষকে শেখায় অন্যকে নিজের মধ্যে দেখা, এবং নিজের অস্তিত্ব অন্যের মধ্যে অনুভব করা। এই উপলব্ধি সহমর্মিতা, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব গঠনের জন্য অপরিহার্য, যা আজকের সমাজে মানবতাবাদের মূল ভিত্তি হতে পারে।

অদ্বৈতবাদের বিষয়বস্তু— অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য হল— "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবে ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। এই উক্তি দর্শনের এক গভীর সত্যকে প্রকাশ করে। এখানে 'ব্রহ্ম' চিরন্তন, অবিনশ্বর, নিরাকার, সর্বব্যাপী চেতনা, আর জগৎ অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী ও মায়ামূলক রূপ। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে জগৎকে মিথ্যা বলা মানে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার নয়, বরং তা পরম সত্যের তুলনায় অনিত্য। মানুষের জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব, দুঃখ, বিভাজন ও ভেদবুদ্ধি এই এই অনিত্য জগৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অদ্বৈতদর্শনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হল আত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা। ব্যক্তি সত্তা বা জীব আসলে ব্রহ্মের প্রতিফলন। যখন এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়, তখন মানুষ নিজেকে পৃথক সত্তা হিসেবে না দেখে সমগ্র মানবসমাজ ও জীবজগৎ এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। এই একাত্মতার বোধ থেকেই মানবতাবাদ জন্ম নেয়।

আধুনিক সমাজে হিংসা, বিভাজন, জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদ, লিঙ্গবৈষম্য, ভোগবাদ ও পরিবেশ ধ্বংসের প্রবণতা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় অদ্বৈতদর্শনের মানবতাবাদী শিক্ষা বিশেষ প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা উপলব্ধি মানুষকে সমতার বোধ শেখায়। আত্মা অভিন্ন হওয়ায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে কোন বিভেদ থাকতে পারে না। এতে সমাজ ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, অদ্বৈতবাদ করুণা ও সহমর্মিতার আদর্শ শিক্ষা দেয়। যদি প্রত্যেকেই এক ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তবে অন্যের দুঃখ নিজের দুঃখ, অন্যের সুখ নিজের সুখ। এই উপলব্ধি মানবিক সহানুভূতির ভিত্তি স্থাপন করে। তৃতীয়ত, জগৎ মিথ্যা মানে অনিত্য— এই চেতনা ভোগবাদী আকর্ষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করে। বর্তমান যুগের বস্তুবাদী প্রবণতা ও ভোগ সংস্কৃতির মাঝে এই দর্শন মানুষকে স্থিরতা, শান্তি ও অন্তর্মুখী আত্ম উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে। চতুর্থত, পরিবেশ সংকট সমাধানে অদ্বৈত দৃষ্টি কার্যকর। প্রকৃতিও ব্রহ্মের প্রকাশ, তাই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই ধারণা পরিবেশবান্ধব মানবতাবাদকে শক্তিশালী করে। উপনিষদের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে— মানুষ যখন আত্মার সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তখন তার কাছে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। জগতে যে বহুত্ব বা বৈচিত্র্য আমরা দেখি, তা আসলে মায়ামূলক। প্রকৃত সত্য একটিই

— তা হল ব্রহ্ম, আর সমস্ত জীব সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। বর্তমানে জাতি ও ধর্মভেদ, সামাজিক বৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য ও হিংসা মানবজীবনকে বিপর্যস্ত করছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই উক্তি মনে করিয়ে দেয়— ভেদবুদ্ধি কেবল অজ্ঞতার ফল, আর জ্ঞানের আলোতে তা বিলীন হয়। সমাজে শান্তি, ন্যায়, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই দর্শন এক অবিচল ভিত্তি।

অদ্বৈততত্ত্ব ও মানবতাবাদ

A) আধ্যাত্মিকতার আলোকে মানবীয় জীবনবোধ— মানবজীবন সর্বদাই এক অন্বেষণের পথ, জাগতিক ভোগের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে চিরন্তন সত্যের সন্ধান। উপনিষদ সাহিত্যে এই চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করার নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। কঠোপনিষদের একটি সুপরিচিত মন্ত্র—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি"॥[৪]

এই মন্ত্র মানবীয় জীবনবোধকে কেবল জাগতিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও স্পষ্ট করে তোলে। মানুষের জীবন প্রকৃত অর্থে পূর্ণতা পায় যখন সে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকময় পথে যাত্রা করে। এখানে 'উত্তিষ্ঠত' মানে আলস্য, ভোগলালসা ও মোহ থেকে উঠে দাঁড়ানো। 'জাগ্রত' মানে অন্তর্মুখী হয়ে আত্মোপলব্ধির জন্য সজাগ থাকা। আর 'প্রাপ্তবরান্নিবোধত' মানে সেই ঋষি বা মহাজ্ঞানীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত সত্য গ্রহণ করা, যারা সত্য উপলব্ধ করেছেন। মানবীয় জীবনবোধ এই শিক্ষার দ্বারা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। জীবন কেবল ভোগ বা বাহ্যবস্তু নয়, এটি একটি অন্তর্গামী যাত্রা। কঠোপনিষদে আত্মাকে ক্ষুরস্য ধারা— অর্থাৎ ক্ষুরের ধারার মতো সূক্ষ্ম, বিপজ্জনক ও কঠিন পথ বলা হয়েছে। মানবজীবনে আধ্যাত্মিক সাধনা তাই এক জটিল সাধনার পথ, যা জ্ঞান, তপস্যা ও ধ্যান দ্বারা অতিক্রম করতে হয়। এই বোধ মানুষকে নৈতিকতা, আত্মসংযম ও মানবিক সহানুভূতির দিকে পরিচালিত করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[৯] এখানে সত্য মানে স্থায়ী সত্তা, যাহা পরিবর্তনশীল জগতের অন্তর্লীন সত্যতাকে নির্দেশ করে। মানুষ যখন জীবনের সত্য অর্থ অন্বেষণ করে, তখন বাহ্য জগতের ভোগ ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দ তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান মানুষকে শেখায় যে চূড়ান্ত সত্য একমাত্র ব্রহ্ম। জ্ঞানম্ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেই পরম চৈতন্য, যাহা স্বপ্রকাশমান এবং জড় জগতের অজ্ঞতার বিপরীত। মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই জ্ঞানলাভে নিহিত। আধুনিক সমাজে মানুষ যখন বস্তুপূজায় নিমগ্ন, তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানই তাকে আত্মবোধ ও মানবতার দিকে ফিরিয়ে আনে। অনন্তম্ নির্দেশ করে অসীমতাকে, যাহা সীমাহীন আনন্দ ও মুক্তির প্রতীক। মানবীয় জীবনবোধ তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন ব্যক্তি বুঝতে পারে তার জীবন কোন সংকীর্ণ সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনন্ত ব্রহ্মের অংশরূপে তার অবস্থান। এই উপলব্ধি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে, সমবেদনা, সহানুভূতি ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" উক্তি কেবল একটি দার্শনিক সত্য নয়, বরং মানবীয় জীবনবোধের মৌলিক ভিত্তি। এটি শিক্ষা দেয় যে জীবনের আসল লক্ষ্য ভোগবিলাস নয়, বরং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও মানবতার বিকাশ। আধুনিককালের বিভ্রান্ত সমাজে এই উপনিষদীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে স্থিতি, নৈতিকতা ও চিরন্তম সুখের দিশা দেখাতে পারে।

B) নৈতিক চেতনা— বিবেক হল নৈতিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিবেকের বিকাশ মানুষকে সৎ-অসৎ, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার শক্তি প্রদান করে। উপনিষদীয় দর্শনে আত্মসন্ধান এবং আত্মানুভূতি মানুষকে এমন এক উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেয় যেখানে বিবেক সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। ভগবদগীতায় উল্লেখ আছে— "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ"[10] শাস্ত্র ও বিবেকের নির্দেশেই নৈতিক সিদ্ধান্তের মূল। বিবেক আত্মোপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হলে মানবীয় জীবনবোধ আরও দৃঢ় হয়। তখন মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ ছেড়ে

সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য কাজ করে। করুণা, মৈত্রী, দয়া, সহিষ্ণুতা— এসব গুণ বিবেকনির্দেশিত নৈতিক চেতনার প্রকাশ। আধ্যাত্মিকতার আলোতে বিবেক মানুষকে ভোগবাদ থেকে মুক্ত করে এবং আত্মোন্নতির পথে চালিত করে। আজকের ভোগবাদী সমাজে আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিবেকের চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ এর মাধ্যমেই মানুষ নিজের মানবিকতা রক্ষা করতে পারে এবং নৈতিকভাবে সুদৃঢ় সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

অহিংসা নৈতিক চেতনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। আধ্যাত্মিকতার আলোকে মানবীয় জীবনবোধে অহিংসা কেবল বাহ্যিক হিংসা থেকে বিরত থাকা নয়, বরং চিন্তা, বাক্য ও কর্মে অকল্যাণকর মনোভাবের অবসান ঘটানো। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষকে শেখায় যে সমস্ত জীবের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। তাই অন্যের প্রতি হিংসা প্রদর্শন আসলে নিজের আত্মার প্রতিই হিংসা প্রদর্শন। মহাভারতে বলা হয়েছে— "অহিংসা পরম ধর্মঃ"[11] সমস্ত ধর্মনীতির মধ্যে অহিংসা সর্বোচ্চ পরম ধর্ম। এখানে অহিংসা বলতে কেবল শারীরিক হিংসা নয়, বরং মানসিক, বাচসিক ও আচরণগত স্তরে সমস্ত প্রকার অকল্যাণকর, বিদ্বেষপূর্ণ ও ক্ষতিকর প্রবণতার অবসান বোঝানো হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার আলোকে অহিংসা কেবল ব্যক্তিগত আচরণের নিয়ম নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ববোধেরও প্রতিফলন। যে সমাজে অহিংসা চর্চা হয়, সেখানে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সমবেদনার পরিবেশ গড়ে ওঠে। ভগবদগীতায় উল্লেখ আছে— অহিংসাকে জ্ঞানী মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য বলা হয়েছে— "অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্"।[12] এভাবে অহিংসা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নৈতিক চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মানবীয় জীবনবোধকে সর্বজনীন শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে— "অহং ব্রহ্মাস্মি"[13] অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম। এই উপলব্ধি আসলে অহংকারকে ধ্বংস করে দেয়। এই উক্তি বোঝায় যে ব্যক্তিগত 'আমি' বা 'অহং' আলাদা কোনো বাস্তব সত্তা নয়, সেটিও সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন। নিরহংকার মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনায় অত্যন্ত জরুরি। অহংকার মানুষকে স্বার্থপর, গর্বিত ও বিচ্ছিন্ন করে তোলে। উপনিষদের বাণী অনুযায়ী, যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে সবকিছু ব্রহ্মময়, সেও ব্রহ্ম— সে অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হয়ে ওঠে। এই বিনয় থেকে জন্ম নেয় সহমর্মিতা, দয়া, সমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবতাবাদ। আধুনিক সমাজে প্রতিযোগিতা ভোগবাদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অহংকারকে তীব্রতর করছে। এর ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ, হিংসা ও বৈরিতা বাড়ছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়— সবাই একই সত্তার প্রকাশ। তাই নিরহংকার চর্চা কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির নয়, বরং সামাজিক শান্তি ও মানবিকতায় জন্য অপরিহার্য।

অদ্বৈতবাদের ঐক্যভাবনা ও বর্তমান সমাজ— অদ্বৈত দর্শনের মূল শিক্ষা হল আত্মা ও ব্রহ্মের অবিভাজ্য ঐক্য। জগতে বহুরূপ প্রকাশ থাকলেও তার অন্তরালে একটিমাত্র চেতনার অবস্থিতি রয়েছে। এই ঐক্যচিন্তা মানুষে মানুষে ভেদ দূর করে সমতার বোধ জাগিয়ে তোলে। ঋগ্বেদের সংজ্ঞান সূক্তে বলা হয়েছে—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি"॥[14]

অর্থাৎ তোমাদের সংকল্প যেন সমান হয়, হৃদয় যেন সমান হয়, মনও যেন সমান হয়; এই মন্ত্রের মূল বাণী হল- মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, বরং চিন্তা, হৃদয় ও চেতনার ঐক্য। বৈদিক যুগে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার সম্পাদনের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আরও গভীর। বর্তমান সমাজে এই মন্ত্রের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। আজ জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ মানবসম্পর্কে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এই বিভাজন দূর করতে হলে হৃদয়ের ঐক্য ও মননের সমতা অপরিহার্য। সংজ্ঞান সূক্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমষ্টিগত ঐক্যই টেকসই মানবসমাজের ভিত্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ"[15]

পরমাত্মা প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থান করছে। আত্মার ঐক্যকে উপলব্ধি করলে মানুষে মানুষে বিভেদ অকারণ হয়ে যায়। জীবের মধ্যে বিভেদ কেবল আপাত, তার মূল সত্তা অভিন্ন। বর্তমান সমাজে যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও অর্থনৈতিক কারণে বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে প্রত্যেক জীবের অন্তরে একই আত্মা অবস্থান করছে, তবে শত্রুতা, বৈষম্য, ঘৃণা বা হিংসার কোন স্থান থাকবে না। তখন সমাজে প্রকৃত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অদ্বৈতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও মানবজীবন— ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় যে সকল ভেদাভেদ আসলে অবাস্তব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি কেবল মানসিক ভ্রম। এই বোধ থেকে মানুষ সমতা, সহিষ্ণুতা এবং মানবপ্রেমের চেতনা অর্জন করে। মানবজীবনে অদ্বৈতবাদের প্রভাব বহুমুখী। প্রথমত, ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে তার প্রকৃত সত্তা অপরের থেকে আলাদা নয়। এর ফলে সমাজে বিভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি দুর্বল হয়। দ্বিতীয়ত, অদ্বৈতবাদ অহংকার ভাঙতে সাহায্য করে, কারণ যখন আত্মা ও ব্রহ্মকে এক হিসেবে দেখা যায় তখন ব্যক্তিগত সত্তা ক্ষুদ্র হয়ে যায় এবং সর্বজনীন সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়। তৃতীয়ত, জীবনের সমস্যার মধ্যেও এক অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়, কারণ মানুষ উপলব্ধি করে যে পরিবর্তনশীল জগত মায়াময়, কিন্তু চিরন্তন ব্রহ্ম অক্ষয়।

অদ্বৈতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ আধুনিক সমাজেও সুস্পষ্ট। সামাজিক বৈষম্য, জাতিগত বিভেদ, ধর্মীয় সংঘাত প্রভৃতি সমস্যার সমাধান এই দর্শনের মাধ্যমে খোঁজা যেতে পারে। যদি মানুষ উপলব্ধি করে যে সবার আত্মা একই ব্রহ্মের অংশ, তবে বিভাজনের যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজকের মানবতাবাদী ও সার্বজনীন সমাজ গঠনে বিশেষ সহায়ক। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে অদ্বৈতবাদ মানুষকে আত্মসংযম, ভোগবিলাস থেকে মুক্তি এবং অন্তরের শান্তির পথে চালিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, অদ্বৈতবাদ কেবল দর্শনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানবজীবন ও সমাজের প্রতিটি স্তরে এক বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। ব্যক্তি যখন এই দর্শনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে তখন মানবজীবন সত্যিকার অর্থে মুক্তি, শান্তি ও সাম্যের পথে অগ্রসর হয়।

উপসংহার— অতএব বলা যায়, অদ্বৈতবাদের আলোয় মানবতাবাদ আজকের সমাজে কেবল একটি দার্শনিক মতবাদ নয়, বরং এক অপরিহার্য জীবনবোধ। আধুনিক সমাজ ক্রমশ বিভজিত হয়ে পড়েছে— ধর্মীয় সংঘাত, বর্ণগত বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতপাত ও লিঙ্গভিত্তিক বিভেদ মানুষের শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। এই প্রেক্ষাপটে অদ্বৈতবাদ আমাদের নতুন দিশা দেখায়। অদ্বৈতবাদ মানুষকে শেখায় ঐক্যের মূল্য, যেখানে প্রত্যেকে সমানভাবে সম্মান মর্যাদা পায়। সমাজ জীবনে এটি সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা করে, কারণ যখন বোঝ যায় যে অপরও আমারই রূপ, তখন ভেদাভেদ আর টেকে না। মানবতাবাদ এর ফলে এক সর্বজনীন চরিত্র অর্জন করে— যেখানে কেবল মানুষের মধ্যে নয়, সমস্ত জীবের প্রতিই সমবেদনা ও মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। এই দর্শন মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত করে এবং বৃহত্তর মঙ্গল ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান ভাঙনমুখর বিশ্বে যেখানে জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় উগ্রতা ও ভোগবাদ সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে তুলেছে, সেখানে অদ্বৈতবাদ এক আশার আলো। অদ্বৈতবাদের শিক্ষা মানবতাবাদকে শক্তিশালী করে, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে শান্তি, সমতা ও ঐক্যের পথে পরিচালিত করে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, অদ্বৈতবাদই হতে পারে প্রকৃত মানবতাবাদী সমাজ গঠনের দিশারী।

Endnotes

1. ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৬
2. শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.১.২
3. শতপথ ব্রাহ্মণ ১.১.২.১৩

4. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.১.১.১
5. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২.৪.১
6. ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩.১৪.১
7. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২.৪.৫
8. কঠোপনিষদ্ ১.৩.১৪
9. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২.১.২
10. শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৬.২৪
11. মহাভারত অনুশাসনপর্ব
12. শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৩.৭
13. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১.৪.১০
14. ঋগ্বেদ ১০.১৯১.৪
15. শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১০.২০

Bibliography

- চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। অদ্বৈতবেদান্তের পরিচয়। ৩য় সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।
- হালদার, হরিহর। বেদান্ত দর্শন ও মানবতাবাদ। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ২০১০।
- দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান ফিলোসফির ইতিহাস। খণ্ড ১। দিল্লি: মুনশিরাম মনোহরলাল, ১৯৯১।
- ছান্দোগ্য উপনিষদ্। উপনিষদসংহিতা। সম্পাদনা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। কলকাতা: উদয়ান লাইব্রেরী, ২০০৪।
- শঙ্করাচার্য। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। সম্পাদনা স্বামী গম্ভীরানন্দ। কলকাতা: উদয়ান প্রকাশন, ১৯৯৬।
- বসু, অজিতকর। ঋগ্বেদের দর্শনচিন্তা। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র। উপনিষদ ও বেদান্তচিন্তা। কলকাতা: মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
- চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ। বেদসাহিত্য সমীক্ষা। কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৯৯৮।
- দেববর্মা, সুধীন্দ্রনাথ। বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১।
- রাধাকৃষ্ণন, এস। Indian Philosophy. খণ্ড ১, নয়া দিল্লি: Oxford University Press, ২০০৮।
- হাজরা, কে. এন। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস. প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০১।
- বৃহদারণ্যক উপনিষদ. বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৭১।
- রাধাকৃষ্ণন, এস উপনিষদ. কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ১৯৫৩।
- মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার. উপনিষদ দর্শন. কলকাতা: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৯৮।
- রাধাকৃষ্ণণ, এস্, দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদস্. কলকাতা: সাহিত্যমন্দির প্রকাশনী, ২০০৬।
- বাসুদেবশাস্ত্রী, হরিদাস। অদ্বৈতবাদ ও মানবতাবাদ, কলকাতা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫।

———